ইসলামিক স্টেট বনাম আল-কায়েদাঃ বাংলাদেশে পৃথক গতিপথ - জেমসটাউন ফাউন্ডেশন

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাম তাসলিমান কাসিরা।

'আম্মা বা'আদ...

সম্প্রতি আমেরিকান রিসার্চ ও অ্যানালাইসিস ইন্সটিটিউট জেমসটাউন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জিহাদি আন্দোলনের ব্যাপারে একটি বিশ্লেষনী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডাইভারজিং ট্রাজেক্টরিস ইন বাংলাদেশঃ ইসলামিক স্টেট ভারসাস আল-কায়েদা ("ইসলামিক স্টেট বনাম আল-কায়েদাঃ বাংলাদেশে পৃথক গতিপথ"), শিরোনামের এ প্রবন্ধটি লিখেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের (ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স) বিশ্লেষক (অ্যানালিস্ট) নাথানিয়েল বার। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ এর ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জিহাদি আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, প্রেক্ষাপট এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। মূলত কুফফার, বিশেষ করে বিশ্ব কুফর শক্তির কেন্দ্র, সাপের মাথা আমেরিকা, কিভাবে বাংলাদেশের জিহাদি আন্দোলনের বর্তমান অবস্থাকে দেখছে তা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় প্রতিবেদনটি থেকে। তবে জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের এ প্রতিবেদনের সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল দেশি মিডিয়ার মতো তারা নিছক কিছু বাঁধা ধরা বুলি আওড়ে যায়নি। বরং তাদের প্রতিবেদন পড়লে বোঝা যায়

তারা দীর্ঘ সময় নিয়ে পুঙ্খানুপুংখ গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এমনকি এ প্রতিবেদনে ‘দাওয়াহ ইলাল্লাহ’ ফোরামের পোস্ট, ‘আল-বালাগ’ ম্যাগাজিণে প্রকাশিত শায়খ তামিম আল-আদনানির প্রতিবেদন ইত্যাদির রেফারেন্সও উঠে এসেছে। কুফফার, বিশেষ করে বিশ্ব কুফরের মাথা জিহাদি কার্যকলাপ এবং এর সাথে যুক্ত সব কিছুকে কতোটা গুরুত্বের সাথে নেয় তা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় কুফফার ও মুরতাদ্দিন এ কাজকে যতোটা গুরুত্বের সাথে নেয়, জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং সমর্থক হিসাবে পরিচিত অনেক, অনেক ভাই-ই ততোটা গুরুত্ব দেন না। এ থেকে এটাও বোঝা যায়, বাংলা ভাষী এবং হয়তো বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন বিশ্লেষক জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করছে।

জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের এ রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ এ লেখায় আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যাতে করে শত্রু কীভাবে আমাদের অবস্থাকে দেখছে, কী ভাবছে তা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা সম্ভব হয়। আশা করি জিহাদি আন্দোলনের সাথে যুক্ত সমর্থক, কর্মী, ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ লেখা উপকারি হবে। তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে জেমসটাউন ফাউন্ডেশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া প্রয়োজন। কেন আমরা তাদের কথা উপস্থাপন করছি, কেন তাদের কথা আমলে নেয়া হচ্ছে, তারা কে, তাদের এজেন্ডা কী –

এসব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলে ইনশাআল্লাহ তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা সহজতর হবে।

জেমসটাউন ফাউন্ডেশনঃ

মূলত জেমসটাউন ফাউন্ডেশন হল আমেরিকার সিআইএ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাথে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি চালু হয় ১৯৮৪ সালে স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। তখন এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী প্রোপাগান্ডা তৈরি করা, প্রচার করা। প্রাথমিক পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে আসা বিভিন্ন কূটনীতিবিদ এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সোভিয়েত বিরোধী রচনা প্রকাশ ও প্রচার করা, সোভিয়েত বিরোধী বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টদের অর্থ ও অন্যান্য লজিস্টিকাল সমর্থন দেয়া ছিল জেমসটাউনের কাজ। প্রকৃতপক্ষে জেমসটাউন শুরু হয়েছিল আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি এবং ডানপন্থি রাজনৈতিক হোমড়াচোমড়াদের একটি ফ্রন্ট হিসাবে। স্নায়ুযুদ্ধ কেন্দ্রিক নানা হিসাবনিকাশের কারণে সরাসরি সিআইএ অথবা আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে আসা এসব “দলত্যাগী” বা “ডিফেক্টর”-দের খোলাখুলি সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছিলো না। একারণে একটি “বেসরকারি” প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয় যার মাধ্যমে এ সরকারি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যায়। জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনার পেছনে প্রকাশ্য দুটো মুখ ছিলো আমেরিকান উইলিয়াম গাইমার এবং সোভিয়ে ডিফেক্টর (দলত্যাগী) আরকাদি শেভচেঙ্কোর।

উইলিয়াম গাইমার ছিল আমেরিকান রিপাবলিকান পার্টির সাথে যুক্ত একজন আইনজীবি। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং রোনাল্ড রিগান, দু জনের শাসনামলেই গাইমার উচ্চ প্রশাসনিক পদে ছিল। অন্যদিকে শেভচেঙ্কো ছিল স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ছেড়ে আমেরিকার পক্ষে আসা সবচেয়ে উচ্চপদস্থ সোভিয়েত কর্মকর্তা। চূড়ান্ত ভাবে সোভিয়েত পক্ষ ত্যাগের আগে সে ছিল জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল।

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হবার পর জেমসটাউন ফাউন্ডেশন মনোযোগ দেয় রাশিয়া, চীন ও ইউরেশিয়া অঞ্চলের দিকে। ৯/১১ এর ঐতিহাসিক বরকতময় হামলার পর জেমসটাউন বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের দিকে (তাদের ভাষায় বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ) মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। জেমসটাউন ফাউন্ডেশন বর্তমানে আমেরিকার পলিসি মেকার অর্থাৎ সামরিক ও রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের জন্য বিশ্লেষন তৈরি করে। সুতরাং তাদের অনেক প্রতিবেদন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হলেও সর্বসাধারণ তাদের উদ্দিষ্ট পাঠক শ্রেণী না। আর তাদের অনেক প্রতিবেদন এমনও আছে যা সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত না। তাদের ভাষায়, তাদের গবেষণা ও বিশ্লেষনের উদ্দেশ্য হল নীতি নির্ধারকের "জানানো ও শেখানো"/"ইনফর্ম ও এডুকেট"-করা। আর একারণেই জেমসটাউন অত্যন্ত পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের পর তাদের প্রতিবেদনগুলো বের করে। সাধারনত যেসব মিথ্যাচার আমেরিকান মিডিয়াতে এবং বিশ্ব মিডিয়াতে করা হয় সেগুলো এখানে স্থান পায় না।

আমেরিকানরা তাদের জনগণের সামনে এ যুদ্ধের একটা অবাস্তব ছবি ঝুলিয়ে রাখতে চায় যাতে করে তাদের অস্তিত্বের প্রতি ক্রমান্বয়ে বড় থেকে বড় হুমকি হয়ে ওঠা এ যুদ্ধের ব্যাপারে জনসমর্থন বজায় রাখা সম্ভব হয়। অন্যদিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নীতি নির্ধারকদের সামনে সঠিক চিত্র তুলে ধরা জরুরী। একারণে এ দু ধরণের পাঠক শ্রেণীর জন্য তৈরি করা প্রতিবেদনে ব্যাপক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন সেনেট কমিটির হিয়ারিং – এও এমন অনেক কথাই উঠে আসে যা কখনোই মূলধারার মার্কিন কিংবা বিশ্ব মিডিয়াতে আলোচিত হয় না।

তথ্যের জন্য জেমসটাউন নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বাহিনী, প্রশাসন এবং সাংবাদিকদের মধ্যে থাকে তাদের বিভিন্ন “সোর্স” – এর ওপর। এছাড়া বিভিন্ন দেশের “সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক গবেষকরাও” – জেমসটাউনকে বিভিন্ন ভাবে তাদের গবেষণা ও বিশ্লেষনের কাজে সাহায্য করে থাকে। জেমসটাউনের হাত কতোটা লম্বা তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, তাদের ওয়েব সাইটে দেয়া তাদের তথ্যের মাঝেই। তারা বলেছে তারা এমন অনেক তথ্য উপস্থাপন করে অনেক সময় যেগুলো জানার একমাত্র উৎস হল বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বাহিনীগুলোর পারস্পরিক তথ্য বিনিময়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক সময় এ তথ্য বিনিময় নানা কারণে ব্যহত হয়। এসব তথ্যও জেমসটাউন প্রকাশ করে। অর্থাৎ বাংলাদেশী কিংবা পাকিস্তানি অথবা ভারতীয় মুরতাদ কিংবা মুশরিক বাহিনী যেসব তথ্য

অফিশিয়ালি মার্কিন সরকার বা সিআইএ-এর কাছে স্বীকার করতে পারে না, রাজনৈতিক চাপ বা অন্যান্য কারণে, সেসব তথ্যও অবাধে জেমসটাউনের কাছে আসে, এবং তারা সেগুলো প্রকাশও করে।

অর্থাৎ জেমসটাউন ফাউন্ডেশন আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির একটি ফ্রন্ট, যেটি বিশ্ব ব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার, প্রশাসন এবং গোয়েন্দা বাহিনীর ভেতরে থাকা আমেরিকান স্পাই, দালাল এবং "সোর্স"-দের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমেরিকার নীতি নির্ধারকদের বৈশ্বিক জিহাদ আন্দোলনের হুমকি সম্পর্কে "জানানো এবং শেখানোর" জন্য গবেষণা ও বিশ্লেষনের কাজ করে। এছাড়া আমেরিকার অন্য দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ রাশিয়া ও চীনের ব্যাপারেও তারা কাজ করে থাকে। আমাদের আলোচ্য প্রতিবেদনের লেখক নিজে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত একজন অ্যানালিস্ট। এ থেকেও আমেরিকার প্রশাসন এবং ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সাথে জেমসটাউনের গভীর সম্পর্কের একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে এ হল জেমসটাউন ফাউন্ডেশন। আর তাদের এ ভূমিকা ও পরিচয়ের কারণেই তাদের বক্তব্যকে আমরা কোন মূল ধারার কুফফার মিডিয়া অথবা অন্য দশজন বিশ্লেষকের বক্তব্য মতো করে দেখবো না। বরং বলা যায় তাদের অবস্থা হল রোমান বাহিনি থেকে পাঠানো সে গুপ্তচরের মতো যে সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বাহিনীর অবস্থা দেখে এসে

বলেছিল, এরা হলেন এমন মানুষ যারা দিনে যুদ্ধে প্রকট আর রাতে তারা স্বীয় রবের সামনে অশ্রুসজল, সিজদায় অবনত। অর্থাৎ যদিও তারা শত্রু পক্ষের কিন্তু তারা নিজ স্বার্থেই অনেক সময় সত্য তথ্য প্রকাশ করে। আর তাই আমরা তাদের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি যাতে করে শত্রুর চিন্তাধারা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি।

আর নিজ প্রতিপক্ষকে চেনা, তাকে বোঝা যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

আইএস বনাম আল-কায়েদাঃ বাংলাদেশে পৃথক গতিপথঃ

লেখক – নাথানিয়েল বার, অ্যানালিস্ট, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স

এবার আমরা চলে যাবো, জেমসটাউনের বাংলাদেশে বিষয়ক প্রতিবেদনে। লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃতি চিহ্নের (“”) ভেতরে এবং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

“বাংলাদেশে কর্তৃত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতায় আল-কায়েদা এবং আইএস ভিন্ন ভিন্ন, প্রায় বিপরীতমুখী রণকৌশল গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইসলামপন্থীদের বিভিন্ন অসন্তোষ কাজে লাগানোর মাধ্যমে জনসমর্থন তৈরির কৌশল গ্রহণ করেছে আল-কায়েদা। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, নাস্তিক এবং যাদেরকে পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রচারক হিসাবে দেখা হয় তাদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত সহিংসতার (targeted violence) মাধ্যমেও আল-কায়েদা

জনসমর্থন তৈরির নীতি গ্রহণ করেছে। বিশ্লেষকদের মতে আল-কায়েদার এ নীতি গেরিলা যুদ্ধের মাওয়িস্ট মডেলের অনুরূপ। এছাড়া আল-কায়েদা তাদের সাংগঠনিক কাজের ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুচিন্তিত, ধীর ও সতর্ক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তারা এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকছে যাতে করে তাদের গুপ্ত কার্যকলাপ প্রকাশিত হতে পারে।

অন্যদিকে তুলনামূলক ভাবে আগ্রাসী ও সরাসরি সংঘর্ষের নীতি গ্রহণ করেছে আইএস। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্য আইএস ধর্মীয় সংখ্যালঘু, পশ্চিমা নাগরিক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনির ওপর হাই প্রোফাইল কিছু হামলা চালিয়েছে।

যদিও এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশে আল-কায়েদাকে আইএস ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু বর্তমানে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের জিহাদি অঙ্গনের গতিপথ আল-কায়েদার অনুকূলে ঘুরে গেছে। আল-কায়েদার বাংলাদেশি শাখা তাদের গোপন সাংগঠনিক কাঠামোর বেশির ভাগ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, দেশের কট্টরপন্থী ইসলামিস্টদের সমর্থন অর্জন করেছে এবং প্রতিবেশি মায়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট থেকে ফায়দা নেয়ার মতো অবস্থানে আছে।

আইএস এর সাফল্য তুলনায় কম। বড় মাপের দর্শনীয় হামলার মাধ্যমে তারা বিশ্বের মনোযোগ এবং পত্রিকার শিরোনাম কেড়ে নিয়েছিলো, তবে একই সাথে এসব হামলার কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো আইএস এর নেটওয়ার্কের ওপর

ক্র্যাকডাউন শুরু করে। যার ফলে গত ১৬ মাসে বাংলাদেশের আইএস-এর ব্যাপক শক্তিক্ষয় হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার উপর আল-কায়েদা ও আইএস এর পৃথক রণকৌশলের প্রভাব পড়বে, একই সাথে আগামী দিনে বিশ্ব মঞ্চে এ দুই জিহাদি দলের প্রতিযোগিতা কিভাবে অগ্রসর হবে তা সম্পর্কেও কিছু ধারণা বাংলাদেশের এ প্রেক্ষাপট থেকে পাওয়া যায়।”

মনোযোগী পাঠক হয়তো খেয়াল করে থাকবেন, ২০১৬ এর আগস্টের সম্ভাব্য এ পরিণতির কথা “গুলশান হামলা ও একটি পর্যালোচনা” নামক লেখায় আমি এমন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলাম। বাস্তবে তাই হয়েছে এবং এ বাস্তবতার স্বীকারোক্তিই জেমসটাউনের প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে।

আল-কায়েদার আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতাঃ

বাংলাদেশে আল-কায়েদার জনসমর্থন তৈরি করার কৌশলের উদ্দেশ্য হল দেশটির রাজনৈতিক ইসলামপন্থি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মাঝের বিভেদকে কাজে লাগানো। ইসলামপন্থি বনাম ধর্মনিরপেক্ষতবাদীদের এ বিভেদ বর্তমানে বাংলাদেশী সমাজের মূল বিভেদ রেখাগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামপন্থি এবং সেকুলারিস্টদের সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবতর্ন আসে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে। ২০১৩ এর জানুয়ারিতে নাস্তিক ব্লগারের ওপর আক্রমণ করা হয়। হামলায় আহত ব্লগারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের মাসে আহমেদ রাজীব হায়দার নামের শাহবাগ আন্দোলনের এক কর্মীকে তার বাসার কাছেই হত্যা করা হয়। মার্চে ঢাকায় শাহবাগের আরেকজন কর্মী হামলায় আহত হয়। এ সহিংসতার নিন্দা জানানোর পরিবর্তে রাজনৈতিক ইসলামপন্থিদের মধ্যে অনেকে এ হামলাকে স্বাগত জানায়। জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবির, যারা রাজিবকে নাস্তিক মনে করতো, এ হত্যাকান্ডের প্রশংসা করে। কয়েক মাস পর, “নাস্তিক ব্লগার”-দের ফাঁসির দাবিতে কয়েক লক্ষ ইসলামপন্থি বিক্ষোভকারী ঢাকায় বিক্ষোভ করে।

শাহবাগ আন্দোলন এবং রাজীবের হত্যার প্রতি রাজনৈতিক ইসলামপন্থিদের মনোভাব আল-কায়েদার জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল সেক্যুলার আদর্শের মোকাবেলায় নিজেদের ইসলামের রক্ষা প্রাচীর হিসাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এবং সেক্যুলার একটিভিস্টদের টার্গেট করার মাধ্যমে কট্টর ইসলামপন্থিদের সাথে একধরনের জোট গঠন। যার ফলে একদিকে যেমন তাদের লোকবল বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ইসলামপন্থিদের রাজনীতি পরিত্যাগ করে জিহাদকে গ্রহণ করায় উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি

হবে। মুসলিম ব্রাদারহুডসহ (ইখওয়ানুল মুসলিমীন) অন্যান্য ইসলামপন্থিদের ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে আল-কায়েদা এ নীতি গ্রহণ করে আসছে।

এ কৌশলগত সুবিধার মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক ২০১৫ সালে গুপ্তহত্যার মিশন শুরু করে। তাদের হামলায় অভিজিৎ রায় সহ বেশ কিছু বিশিষ্ট সেক্যুলার একটিভিষ্ট নিহত হয়। আল-কায়েদা, যারা বাংলাদেশে আনসার আল-ইসলাম নামে কাজ করে, তাদের এ সুচিন্তিত সহিংসতাকে আরো জোরালো করার জন্য হত্যা পরবর্তী বিবৃতির মাধ্যমে প্রপাগান্ডা চালু করে। এসব বিবৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের ইসলামি মূল্যবোধের রক্ষাকারী দল হিসাবে চিত্রিত করে এবং বাংলাদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক ইসলামপন্থিদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চালায়।

এর আগে ২০১৪ সালে প্রকাশিত এক ভিডিওতে আল-কায়েদা নেতা আইমান আয-যাওয়াহিরি বাংলাদেশীদের "ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার আগ্রাসনের মোকাবেলায়"- বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলার আহবান জানান। এ ধরণের বার্তার পাশাপাশি আল-কায়েদা ইসলামপন্থিদের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ব্যাপারে সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। সমালোচনা ও উদ্বুদ্ধকরনের এ মিশেলের মাধ্যমে আল-কায়েদা বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের সম্পূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করাতে চায়।

যদিও বাংলাদেশ নিয়ে আল-কায়েদার পরিকল্পনার মূল হল সহিংস পদ্ধতি, তথাপি টার্গেট নির্ধারনের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা করাকে এড়িয়ে গেছে, সম্ভবত এর কারণ হল তারা মনে করে এরকম করা হলে তাদের নেটওয়ার্কের ওপর ব্যাপক ক্র্যাকডাউন হবে।

আর তাই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ একটিভিস্টদের টার্গেট করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হামলাটি হয় ২০১৬ এর এপ্রিলে। এ হামলায় আনসার আল-ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম সমকামি ম্যাগাজিন এর সাথে যুক্ত এক্টিভিস্টদের হত্যা করে। তবে যদিও এ টার্গেটটি ভিন্ন ছিল, কিন্তু নাস্তিকদের ওপর হামলার বৈধতা যেভাবে দেয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবেই তারা এ হামলার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। টুইটারে প্রকাশিত বিবৃতিতে আনসার আল-ইসলাম দাবি করে সমকামিতার প্রচারনার পক্ষে এ দুই একটিভিস্টের কাজ মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে চালানো "বৈশ্বিক সামরিক ও আদর্শিক যুদ্ধের অংশ"।

মূলত এ বিষয়টি হল জিহাদি মানহাজের উসুল অর্থাৎ মূলনীতিসমূহ ঠিক রেখে প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পলিসি গ্রহণের। যেমন ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন মুসলিম বিশ্বের মুরতাদ্দিন শাসকদের পরিবর্তে ক্রুসেডার-যায়োনিস্টদের

মুজাহিদিনের হামলার টার্গেট বানাতে। কারণ উম্মাহর জন্য এ শত্রুর বিরুদ্ধে এক হওয়া সহজ। জায়েজ বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে উত্তম ও উপযোগীটিকে বেছে নেয়াই হিকমাহ। দুঃখজনক আইএস "ইরাকি মেন্টালিটি" নিয়ে ইরাকি পলিসি হুবহু বাংলাদেশে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে, এবং ব্যর্থ হয়েছে।

সহিংসতাই লক্ষ্য বনাম "লক্ষ্য অর্জনের উপকরণ হিসাবে সহিংসতার ব্যবহারঃ

"আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত সহিংসতার নীতির বিপরীতে আইএস বেছে নেয় দর্শনীয়, শোরগোল ফেলা সহিংসতার নীতি। বাংলাদেশে আইএস এর নেটওয়ার্ক নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয় ২০১৫ এর সেপ্টেম্বরে। ইটালিয় এক এইডকর্মীকে হত্যা করার মাধ্যমে। পরবর্তী কয়েক মাসে শিয়া, ক্বাদিয়ানিসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়ে তারা হত্যা করে। আইএস এর বাংলাদেশ স্ট্র্যাটিজি, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চলে নেয়া তাদের স্ট্র্যাটিজির অনুরূপ। যেমন সংখ্যালঘুদের ওপর চালানো হামলার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা। এর আগে ইরাকে এ কৌশল ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করে। একই ভাবে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও তারা আইনশৃংক্ষলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিদেশীদের হামলার টার্গেট বানায়। কিন্তু আল-কায়েদার কৌশলের মতো আইএস এর এ নীতি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই ও উপযুক্ত ছিল না।

অন্যদিকে আল-কায়েদার বাংলাদেশি শাখা জনগণের সামনে আইএস এর সাথে তাদের পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার এ সুযোগ কাজে লাগায়। মে ২০১৬ তে প্রকাশিত এক বক্তব্যে আল-কায়েদা "নওমুসলিম" এবং "এমন ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই" হত্যার সমালোচনা করে। একই বক্তব্যে আনসার আল-ইসলাম সমকামি কর্মীদের ওপর হামলা করার বৈধতা পুনর্ব্যক্ত করে, এবং এই হামলায় অনিচ্ছাকৃতভাবে এক সিকিউরিটি গার্ড আহত হবার কারণে দুঃখপ্রকাশ করে। এমনকি তারা এও বলে যে কেবল আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে তাদের এমনটা করতে হয়েছে এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন না থাকলে তারা আহত গার্ডকে এ ব্যাপারে ক্ষতিপূরন দিতো।

আইএস এর মোকাবেলায় আল-কায়েদার বৈশ্বিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ বক্তব্য ফুটে উঠেছে – সহিংসতায় আইএসকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টার বদলে, আল-কায়েদা নিজেদেরকে আরো সংযত ও সুচিন্তিত খেলোয়াড় হিসাবে উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশে আইএস এর মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতাকে আল-কায়েদা রাজনৈতিক ইসলামপন্থিদের নিজেদের আরো কাছে টানার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

তবে আইএস এসব সমালোচনার ধার ধারে নি। সহিংসতার মাত্রা আরো বাড়িয়েছে। বাংলাদেশে আইএস এর কর্মকান্ডের চূড়া স্পর্শিত হয় জুলাই ২০১৬ তে চালানো হলি আর্টিজানের হামলার মাধ্যমে। কূটনৈতিক, বিদেশি এবং ধনী বাংলাদেশীদের পছন্দের

অভিজাত এলাকায় অবস্থিত এ রেস্টুরেন্টে হামলা চালিয়ে আইএস রেস্টুরেন্টে থাকা লোকদের জিম্মি করে এবং ২০ জনকে হত্যা করে। তাদের বৈশ্বিক প্রপাগান্ডা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আইএস এ হামলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ মনোযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়েই তারা ঘটনাস্থলের বিভিন্ন ছবি প্রকাশ করে এবং হামলার দায় স্বীকার করে নেয়। হামলা চলাকালীন সময়েই দায় স্বীকারের এ ঘটনা ছিল আইএস এর জন্য প্রথম।”

সহিংসতা মূল লক্ষ্য না বরং লক্ষ্য অর্জনের উপকরণ। তবে মুসলিম হিসাবে আমরা আরো স্পষ্ট ভাবে এভাবে বলতে পারি যে, আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য দুটি।

১) ফরয ক্বিতালের দায়িত্ব পালন করা, এর মাধ্যমে দখলকৃত মুসলিম ভূমিগুলো মুক্ত করা এবং নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্য করা।

২) আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা এবং আমরা শারীয়াহর আলোকে মনে করি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পদ্ধতি বা মানহাজ হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিঃ

“স্বল্পমেয়াদী সামরিক ও প্রপাগান্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও এ হামলা সফল ছিল, কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে এটি পরবর্তীতে অবিবেচনাপ্রসূত হিসাবে প্রমাণিত হয়। হামলার আগে জিহাদি দলগুলোর ব্যাপারে কীভাব অগ্রসর হওয়া উচিৎ এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্ধে থাকলেও,

হামলার পর আইএস এবং আল-কায়েদা, দুই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশ সরকার বড় ধরণের এক কাউন্টার টেররিজম ক্যাম্পেইন শুরু করে।

গত ১৫ মাসে বাংলাদেশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইএস এর নেটওয়ার্কের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে, তাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের হত্যা অথবা বন্দী করেছে। তাদের মধ্যে হলি আর্টিজাল হামলার কথিত মূল পরিকল্পনাকারী তামিম আহমেদ চৌধুরি ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর জাহাঙ্গির আলম অন্যতম। হলি আর্টিজানে হামলাকারীদের জাহাঙ্গির আলম প্রশিক্ষন দিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ২০১৭ এর মার্চে আইএস আরেকটি বড় আঘাতের সম্মুখীন হয় যখন বাংলাদেশে আইএস এর শীর্ষ কমান্ডার মাইনুল ইসলাম মুসা একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নিহত হয়।

সন্ত্রাসবিরোধী এসব অভিযান আইএস এর সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন্দল দেখা দিয়েছে। যদিও হলি আর্টিজাল হামলার পর, ২০১৭ এর মার্চে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর তিনটি হামলা সহ, তারা বেশ কিছু অপারেশন করেছে, তথাপি তাদের কাজের গতি স্থিমিত হয়ে গেছে এবং তাদের নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ যেমন সামরিক প্রশিক্ষক, অস্ত্র পাচারকারী এবং বোমা বিশেষজ্ঞদের মেরে ফেলা অথবা বন্দী করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আইএস এর শীর্ষপর্যায়ের নেতাদের হত্যা ও বন্দির ফলে নেতৃত্ব নিয়ে এক সংকট দেখা দেয় যা সংগঠনকে বিভক্ত করে ফেলে। বাংলাভাষী একটি পত্রিকার ভাষ্যমতে

মাইনুল ইসলাম মুসার মৃত্যুর পর তাদের এক কমান্ডার আইয়ুব বাচ্চুকে নেতৃত্বের জন্য বেছে নেয়া হয়। এর ফলে মুসার অধীনস্ত হাসিদুর রহমান ওরফে সাগর নিজের নেতৃত্বে একটি পৃথক দল তৈরি করে। একই পত্রিকার সূত্রে জানা গেছে যে, আইএস এর এ দুটি অংশ পরস্পরের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ এনেছে, যার কারণে তাদের মধ্যে কিছু সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে।

অন্যদিকে আইএস এর হামলার কারণে শুরু হওয়া সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান আল-কায়েদার বাংলাদেশ স্ট্র্যাটিজির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ব্যাহত করেছে। হলি আর্টিজান হামলার আগে আল-কায়েদা নিজেদের দিকে যথাসম্ভব কম মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিল, যাতে করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সজ্ঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া যায়। এ নীতি বস্তুত আল-কায়েদার কৌশলগত ধৈর্য (Strategic Patience) এর প্রতিফলন। যদিও আল-কায়েদা বাংলাদেশি সরকারকে মুরতাদ মনে করে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে গণবিপ্লব শুরু করার মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়, কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ হল এ মূহুর্তে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যাবার মত অভ্যন্তরীন সক্ষমতা ও লোকবল তাদের নেই। একারণে হলি আর্টিজান হামলার আগের বছরগুলোতে আল-কায়েদা মূলত টার্গেট কিলিং এবং তাদের গুপ্ত নেটওয়ার্ক প্রসার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল যাতে করে রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া যায়।

হলি আর্টিজানের পর যখন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু হয়, তা আল-কায়েদার এ সম্প্রসারণ নীতির প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ নিয়ে আসে। যার ফলে সংগঠনটি বাধ্য হয় ব্যাপকভাবে তাদের সামরিক কার্যকলাপ কমিয়ে আনতে। সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে এক আল-কায়েদা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (দাওয়াহ ইলাল্লাহ) এক লেখায়, অচেনা এক লেখক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করানোর জন্য আইএস এর সমালোচনা করে। পাশপাশি জাহাঙ্গির আলমের মতো দক্ষ জঙ্গিদের আইএস সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারেনি বলেও অভিযোগ করে।

যদিও আল-কায়েদার নেটওয়ার্ক গত এক বছরে বেশ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের বেশ কিছু সদস্য গ্রেফতার হয়েছে, যার মধ্যে আছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের আইটি এক্সপার্ট, যার ব্যাপারে নাস্তিক একটিভিস্টদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ করা হচ্ছে – তবুও আইএস এর তুলনায় আল-কায়েদা সন্ত্রাসবিরোধী ক্র্যাকডাউনের অপেক্ষাকৃত ভালো মোকাবেলা করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর জিয়াউল হক সহ আল-কায়েদার উচ্চতর নেতাদের অনেকেই ধরা পড়েনি। জিয়াউল হক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন অবস্থায় ২০১২ সালে সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের এক ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্বীকার করে যে আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তারা তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। প্রতিকূলতার মুখে সংগঠনটির এ দৃঢ়তার কারণ সম্ভবত তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত সেল-ভিত্তিক কাঠামো।”

শত্রুর প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে ফরয দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা গোমরাহি। শত্রুর প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা না করে, সঠিক ভাবে হিসাবনিকাশ ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়া সামরিক পদক্ষেপ নেয়া বোকামি।

পুনরুত্থানের পথে আল-কায়েদাঃ

“নেটওয়ার্ক মোটামুটি অক্ষত থাকার কারণে বাংলাদেশে আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। গুলশান হামলার ফলাফল দেখার পর তারা সম্ভবত সন্ত্রাসবিরোধি অভিযানের আগে তারা যে সতর্ক সম্প্রসারণের নীতি অনুসরণ করছিল, তাতে ফেরত যাবে। এবং এর মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি আরো সম্প্রসারিত করবে।

বাংলাদেশে আল-কায়েদার নেটওয়ার্কের উপস্থিতি, মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রভাব বৃদ্ধির একটি বাহন হিসাবেও কাজ করতে পারে। রাখাইন রাজ্যে একটি উদীয়মান ইসলামপন্থি বিদ্রোহি আন্দোলনের উত্থান ঘটছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে যে আল-কায়েদার বাংলাদেশি কর্মীরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের নিজেদের দলে ভেড়াচ্ছে, এবং তারা আর্থিক ভাবে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা)-কে সহায়তা করছে।

সবশেষে, আল-কায়েদা হয়তো আইএস এর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্ট্র্যাটিজির ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে মোহমুক্তি ঘটা বিভিন্ন আইএস সদস্যকে নিজেদের দলে নিতে পারবে।”